বিশেষ ক্রোড়পত্র
অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ◆ সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০৩ চৈত্র ১৪৩০
১৭ মার্চ ২০২৪

বাণী

১৭ মার্চ বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় দিন। ১৯২০ সালের এই দিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জের নিভৃতপল্লি টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে এসেছিলেন বলেই আমরা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছি এবং স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আর এজন্যই আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। জাতির পিতার ১০৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি মহান এ নেতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

গ্রামের কাদা-জল, মেঠো পথ আর প্রকৃতির খোলামেলা পরিবেশে বেড়ে ওঠা বঙ্গবন্ধু শৈশব থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদি কিন্তু অধিকার আদায়ে আপসহীন। পরোপকার আর অন্যের দুঃখ-কষ্ট লাঘবে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। জীবনের প্রতিটি ক্ষণে যেখানেই অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নির্যাতন দেখেছেন, সেখানেই প্রতিবাদ করেছেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে ব্রিটিশ বিরোধী সভা-সমাবেশে অংশ নেন তিনি। এছাড়া গরীব ছাত্র- ছাত্রীদের লেখাপড়ার খরচ চালাতে 'মুসলিম সেবা সমিতি' পরিচালনা করেন। চল্লিশের দশকে এই তরুণ ছাত্রনেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সংস্পর্শে এসে সক্রিয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের কিছুদিন পরই তরুণ নেতা শেখ মুজিব বুঝতে পেরেছিলেন, ব্রিটিশ পরাধীনতার কবল থেকে মুক্তি পেলেও বাঙালি নতুন করে পশ্চিমাদের শোষণের কবলে পড়েছে। শাসকগোষ্ঠী প্রথম আঘাত হানে বাঙালির মায়ের ভাষা 'বাংলা'র ওপর। বাংলা ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালনকালে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ বঙ্গবন্ধু সচিবালয় গেট থেকে গ্রেফতার হন। এভাবে আন্দোলন-সংগ্রাম ও কারাভোগের মধ্য দিয়েই তিনি বাঙালির অধিকার আদায়ের পথে এগিয়ে চলেন। ১৯৪৮ সালে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ', '৫২ এর ভাষা আন্দোলন', '৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন', '৫৮ এর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন', '৬৬ এর ৬-দফা', '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান', '৭০ এর নির্বাচন'সহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। কিন্তু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনো শাসকগোষ্ঠীর সাথে আপস করেননি।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাঙালির আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম", যা ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ। এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু শুধু স্বাধীনতার ডাকই দেননি বরং মুক্তিযুদ্ধের রূপরেখা ও ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কেও দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর আক্রমণ চালালে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি অবস্থায় শাসকগোষ্ঠী তাঁকে প্রহসনমূলক বিচারের মাধ্যমে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল। অকুতোভয় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা"। দেশ ও জনগণের প্রতি তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য বাংলা, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু আজ এক ও অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতার পর পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে জাতির পিতা ১০ জানুয়ারি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। দেশকে 'সোনার বাংলা' হিসেবে গড়ে তোলার সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণ হতে দেয়নি। কিন্তু হায়েনার দল বুঝতে পারেনি জীবিত বঙ্গবন্ধুর চেয়ে লোকান্তরের বঙ্গবন্ধু অনেক বেশি শক্তিশালী।

জলে-স্থলে-আকাশে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে শত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছা যায়। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না"। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে দেশ স্বাধীন হয়েছিল, অনেক চড়াই-উতরাই পার হয়ে সেই বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ। সকল আশঙ্কা ও নেতিবাচক ধ্যান- ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে জাতির পিতার অসমাপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে চলেছেন তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আজ আমরা দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছি একটি উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অভিমুখে।

বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির চিরন্তন প্রেরণার উৎস। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন নীতি ও আদর্শের প্রতীক। বাংলাদেশকে জানতে হলে বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে হবে, বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে জাতি এগিয়ে যাক ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পথে, নোঙ্গর ফেলুক বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলায়'।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মো. সাহাবুদ্দিন

এ এক অভূতপূর্ব দিন

আনোয়ারা সৈয়দ হক

এ এক অভূতপূর্ব দিন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন।

এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনেই আমাদের দেশে 'জাতীয় শিশু দিবস।'

যে মানুষটি জীবনের সোনালি সময়গুলি জেলখানায় বসে কাটিয়ে গিয়েছেন, যিনি তার কোনো সন্তানের জন্মের সময়ই বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না বা থাকতে পারেন নি বা জেলখানায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন এবং জন্মের পর তাদের চোখে দেখতে না পাওয়ার জন্য মনের ভেতরে হাহাকার লুকিয়ে রেখেছিলেন, যা কখনো তিনি প্রকাশ করেন নি;

আবার যিনি তাঁর ছোটো ছোটো সন্তানদের বড়ো হয়ে ওঠা চোখে দেখেন নি বা দেখতে পারেন নি, যিনি তাঁর সন্তানদের দৈনন্দিন বড়ো হয়ে ওঠার কোনো সুখ -স্মৃতি মনের কোটরে জমা রাখতে পারেননি, তাদের সেভাবে চোখের সামনে বড়ো হয়ে উঠতে দেখেননি বলে; যিনি তাঁর ছোট্ট মেয়ে রেহানাকে জেলখানায় লাজুক মুখে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মনে মনে ভেবেছেন, আমি জানি আমার এই মেয়েটি আমার কাছে আসতে চায়, আদর চায়, কিন্তু লজ্জায় কাছে আসতে পারছে না;

আবার শিশু রাসেল যখন বাবাকে কাছে পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে কেঁদেছে, জেলখানায় একবার তাঁকে দেখতে গেলে সে কিছুতেই বাবার কোল থেকে নামতে চাইত না, আব্বা , আব্বা বলে কাঁদত, বঙ্গমাতা রাসেলকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য যখন নিজেকেই আব্বা বলে ডাকতে রাসেল কে ভুলিয়েছিলেন, আর ছোট্ট অবোধ রাসেল জেলখানায় এসে তার বাবার সামনেই তার মাকে যখন আব্বা, আব্বা বলে ডাকত, তখন তাঁর বুক ভেঙে যেত নিজের ঔরসের সন্তানের মুখে বাবা বেঁচে থাকতেও মা কে বাবা বলে সম্বোধন করবার জন্য, তখন পিতা হয়ে অপরাধবোধে ভরে যেত তাঁর বুক, সন্তানকে বাধ্য হয়ে নিজের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চনা করবার জন্য;

আবার যখন তিনি জেলখানার বাহিরে তখনও দেশের মানুষের জন্য সারাটা দেশ ঝটিকা সফর করে বেড়িয়েছেন, বাড়িতে ফিরে যাওয়ার সময় করে উঠতে পারেননি, যিনি তাঁর পুরো দেশটিকেই নিজের পরিবারের মতই নিকট দৃষ্টিতে দেখতেন, দেশের প্রতিটি বিপর্যয়ের সময় যে মানুষটি জনগণের দ্বারপ্রান্তে, সেই মানুষটির মনের ভেতরে তাঁর নিজের ছোটো ছোটো সন্তানদের জন্য একটি হাহাকার কল্পনা করা যায় সর্বদাই বিরাজমান ছিল।

জনগণের জন্য জীবন উৎসর্গ করা মানুষটি তাঁর এই কষ্টের কথা কখনোই মুখ ফুটে কাউকে বলেন নি, রাতের বেলা অন্ধকার কুঠরিতে বসে নিজের মনের কষ্টের কথা শুধু ডায়েরির পাতায় লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৩ চৈত্র ১৪৩০
১৭ মার্চ ২০২৪

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী এবং 'জাতীয় শিশু দিবস-২০২৪' উপলক্ষ্যে তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং দেশের সকল শিশুসহ দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। জাতীয় শিশু দিবসে এ বছরের প্রতিপাদ্য- 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ধরে, আনব হাসি সবার ঘরে' সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ঐতিহ্যবাহী শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন নির্ভীক, দয়ালু এবং পরোপকারী। স্কুলে পড়ার সময়েই তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ লাভ করতে থাকে। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই বিশ্ববরেণ্য নেতার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে ওঠেন বাংলার নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ের শেষ আশ্রয়স্থল। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ এই বাঙালি বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৮ সালে তাঁর প্রস্তাবে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট পালনকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। কখনও জেলে থেকে কখনও বা জেলের বাইরে থেকে তিনি ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ছাত্র-জনতার চূড়ান্ত আন্দোলনে কারান্তরীণ অবস্থায় থেকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় '৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮-র আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, '৬২-র শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, '৬৬-র ছয় দফা, '৬৮-এর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন এবং '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের শিশুদের প্রতি অপরিসীম মমতা ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ; শিশুরাই তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। শিশুদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে হবে সবার আগে- এই ভাবনা থেকেই জাতিসংঘ শিশুসনদের ১৫ বছর আগে ১৯৭৪ সালে তিনি শিশু আইন প্রণয়ন করেন। শিশু শিক্ষার বিকাশ নিশ্চিত করতে প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনকে শিশুদের জন্য উৎসর্গ করে ১৭ মার্চ 'জাতীয় শিশু দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে এবং শিশুদের কল্যাণে নানামুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে আমরা 'জাতীয় শিশুনীতি-২০১১', 'শিশু আইন ২০১৩', 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন- ২০১৭' প্রণয়ন করেছি। এছাড়া সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পুনর্বাসন এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিকাশে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের বছরের শুরুতে বিনামূল্যে নতুন বই প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় শতভাগ শিশু আজ স্কুলে যাচ্ছে। আমরা শিশুদের জন্য জাতির পিতার জীবন ও কর্মভিত্তিক বই প্রকাশ এবং পাঠ্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরেছি। এছাড়াও শিশুদের আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য তথ্যপ্রযুক্তিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার উপযোগী সবরকম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় শিশু দিবসে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি মহান নেতার জীবন ও আদর্শ অনুসরণে এ দেশের শিশুদের যথাযোগ্য সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আজকের শিশুরাই হবে ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট জনগোষ্ঠী। ভবিষ্যত বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবে আজকের শিশুরাই। আসুন, দলমতনির্বিশেষে সকলে মিলে একযোগে কাজ করে শিশুদের মনে দেশপ্রেম জাগ্রত করে তাদের ব্যক্তিত্ব গঠন, সৃজনশীলতার বিকাশ, আত্মবিশ্বাসী এবং মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলি ।

আমি 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী' এবং 'জাতীয় শিশু দিবস-২০২৪' উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্র দর্শন

অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান

সৃষ্টিকর্তা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, আর সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। মানুষের সৃষ্টি হচ্ছে রাষ্ট্র , মানুষ দুনিয়াতে যা কিছু সৃষ্টি করেছে সবচেয়ে বড়ো সৃষ্টি হচ্ছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র যদি না থাকতো আমাদের যা কিছু অর্জন-বিজ্ঞান, সমাজ, ধর্ম, উদ্ভাবন, সবই ভূলুণ্ঠিত হতো। রাষ্ট্র কাঠামো আছে বলেই সবগুলো রক্ষিত হচ্ছে । যেটা আজকের বাংলাদেশ, এই ভূখণ্ডে বিভিন্ন রকমের রাজা ছিল, সামন্তবাদী জমিদার ছিল, ভুঁইয়ারা ছিল, এমন বহু কিছু ছিল, কিন্তু এই অঞ্চল কখনো একটা আধুনিক রাষ্ট্র হবে সেটা কখনো কেউ চিন্তা করেনি। একটি স্বাধীন সার্বভৌম আধুনিক রাষ্ট্র তৈরি করে দিয়ে গেছেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এটা তিনি কীভাবে করলেন সেটা শুধু তাঁর রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে আলোচনা করলেই অনুধাবন করা যায়। ব্রিটিশরা যখন ঔপনিবেশিক শাসন ছেড়ে চলে যাবে বা যেতে বাধ্য হচ্ছে তখনি আমাদের পূর্ব পুরুষরা এই ভূখণ্ডে বসবাসকারীদের একেবারে দুটো জাতিতে বিভক্ত করে। একটা হিন্দু, আরেকটা মুসলমান। এর সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশরা তাদের চক্রান্ত অনুযায়ী পাকিস্তান এবং ভারত দুটো রাষ্ট্র তৈরি করে। আমাদের এলাকার লোকেরা অর্থাৎ এই পূর্ব-বাংলার লোকেরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য ভোট দিয়েছিল। হিন্দুদের একটা রাষ্ট্র, মুসলমানদের আরেকটা রাষ্ট্র। যদিও এর মধ্যে কারসাজি ছিল। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মনে কখনই এরকম একটা সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ভাবনা স্থান পায়নি, এটা তার মাথায় ছিল না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাঙালি জাতীয় চেতনা ভিত্তিক বাংলাদেশই তাঁর কল্পনার রাষ্ট্র ছিল। তবে সে সময়ের বাস্তবতায় সাম্প্রদায়িক চেতনার বিপরীতে হঠাৎ করে একটা রেডিকেল কিছু করা বাস্তব সম্মত নয় বলেও মনে করতেন। যার কারণে আজকের যে আওয়ামী লীগ, মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বকারী দল, সেটা কিন্তু

প্রথমে আওয়ামী লীগ ছিল না আওয়ামী মুসলীমলীগ ছিল। ১৯৫৫ সালে বঙ্গবন্ধু অনেকটা একক কর্তৃত্ব ও সাংগঠনিক ক্ষমতায় আওয়ামী মুসলীমলীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেন। শুরুতেই যদি এই আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম বাদ দেয়া হতো তাহলে দলটি এভাবে এ পর্যায়ে আসতেই পারতো না। কারণ মানুষের মন মানসিকতা তখনও ঐভাবে তৈরি হয়নি। একটা সাম্প্রদায়িক ভাব মানুষের মনে যে কোনো কারণেই হোক ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শেষের দিকে এসে জোরালো হয়। তারপরেও পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান এবং পাকিস্তান তৈরি হলো। প্রথম আঘাতটাই আসে আমাদের ভাষার উপরে।

ছয়দফা আন্দোলনের প্রথম দফাটি ছিল ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়েছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলে মুসলমানদের জন্য দুটি আলাদা রাষ্ট্র করা হবে। আর এটাকে কেটে একটা রাষ্ট্র করা হলো। প্রত্যেকটা স্টেটকে স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে, সেটা ছিল ৬ দফা। ভারত ৬ দফা প্রণয়ন করে দিয়েছে এটা বলার বহু লোক এদেশে ছিল। আর এই কারণে খোদ বাঙালির জননেতা শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৬৬) ছয় দফার পক্ষে *'আমাদের বাঁচার দাবি'* পুস্তিকায় জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন –

"অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবি যখন উঠিয়াছে তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈচৈ করিয়া উঠিয়াছে। আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মুক্তির সনদ একুশ দফা দাবি, যুক্ত নির্বাচন প্রথার দাবি, ছাত্র তরুণদের সহজ ও স্বল্প ব্যয়ে শিক্ষালাভের মাধ্যম করার দাবি ইত্যাদি সকল প্রকার দাবির মধ্যেই এই শোষকের দল ও তাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। আমার প্রস্তাবিত ছয়দফা দাবিকেও তেমনিভাবে পাকিস্তানকে দুই টুকরা করবার দূরভিসন্ধি আরোপ করতেছেন।"

জামায়াত ইসলামী শেখ মুজিবকে ভারতের 'এজেন্ট' আখ্যা দিয়ে ছয় দফা ভারতের প্রণীত বলে দাবি করে। বামপন্থী বিভিন্ন দল এমনকি ন্যাপ (ভাসানী) ছয় দফার সমালোচনা করেছে। ছয় দফার বিরুদ্ধে ন্যাপ-ভাসানী সবচেয়ে বেশি সোচ্চার ছিলো। বাঙালিকে হতবাক করে দিয়ে মাওলানা ভাসানীও ছয় দফাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বস্তুত ৬ দফার মধ্যে সরাসরি স্বাধীনতার কোনো কথাও ছিল না, স্বায়ত্তশাসনের কথা ছিল। ১৯৭০ এর নির্বাচনে পূর্ব-পাকিস্তানে ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন আওয়ামী লীগ পেয়ে যায়। তবে ভোটের হিসাবটা ভিন্ন। জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ভোট পেয়েছিল ৭২. ৫৭ শতাংশ। নির্বাচনি এই ফলাফলের আরেক অর্থ হলো- ৬ দফার বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল ২৭.৪৩% বাঙালি। তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই দেশের এক চতুর্থাংশেরও বেশি লোক স্বাধীনতা তো দূরের কথা, ৬ দফারও বিরুদ্ধে ছিল। অতএব আমরা সমগ্র জাতি মিলে যুদ্ধ করেছি এটা সঠিক বলি না। এই ২৭.৪৩% শতাংশ লোক মুক্তিযুদ্ধের সময় যাদেরকে আমরা বলি আলবদর, রাজাকার, যুদ্ধাপরাধী, আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং হত্যা, রাহাজানি, লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগ এসমস্ত কাজে তারা অংশগ্রহণ করে; পাকিস্তানি

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

মার্চের কাছে বাঙালির যত ঋণ

নাসির আহমেদ

মার্চে প্রথম শুনেছে বাঙালি মুক্তির জয়গান
সাতই মার্চের বজ্রকণ্ঠে উদাত্ত আহ্বান
প্রথম জাগালো ঘুমন্ত এই জাতিকে একাত্তরে
বঙ্গবন্ধু মুক্তির দূত! তোমারই মুখটি আজও জাগে অন্তরে।

হাজার বছর পরাধীন জাতি সেই তো প্রথম জানে
পরাধীনতার শৃংখলছেঁড়া মহা মুক্তির মানে!
দুঃশাসনের, নির্যাতনের নির্মম অপমানে
জ্বলে উঠেছিল এই দেশ পিতা তোমারই তো আহ্বানে।

অসহযোগের সেই মার্চ আজও জেগে আছে চেতনায়
হে মহামানব! সেই গৌরব চির বহমান ইতিহাস লিখে যায়।
চির অম্লান, চির অক্ষয় সাতই মার্চের বজ্রকণ্ঠ-বাণী
কী করে ভুলবো মুছে দিয়েছিল পরাধীনতার গ্লানি!

যারা ভুলে যায় তারা কি বাঙালি? তারা চির দুশমন
বঙ্গবন্ধু তুমি তো অমর, তুমি বাঙালির আজও মহা জাগরণ।
লক্ষ তারায় আকাশটা ভরা, সূর্য তো একটাই
সূর্যের মত প্রোজ্জ্বল তুমি, তোমার তুলনা নাই।

বাঙালির প্রতি নিঃশ্বাসে তাই তোমারই প্রতিধ্বনি
আকাশে-বাতাসে সেই সে কণ্ঠ আজও ওঠে পিতা রণি।
পরাধীন এই জাতির কি হতো স্বাধীনতা কোনোদিন?
সে জাতিকে তুমি মুক্ত করেছো,দিয়েছো রক্তঋণ।

সব অর্জনে উৎস তুমিই, তুমি যে মহান 'মার্চের সন্তান'
কোনোদিন শোধ হবে না সে ঋণ, তোমার যে অবদান।
পঁচিশ এবং ছাব্বিশে মার্চ চির স্মরণীয় আনন্দ- বেদনায়।
তারও তো উৎস চির উজ্জ্বল সতেরোই মার্চ, জন্মের মহিমায়!

তোমার জন্ম মানেই তো পিতা দেশের জন্মদিন
তুমি এসেছিলে বলেই তো এলো স্বাধীনতা একদিন।
জেনে রেখো পিতা তোমাকে এ দেশ ভুলবে না কোনোদিন
রক্ত দিয়েই শোধ করি যেন তোমার রক্তঋণ।

তোমার স্বপ্ন সোনার বাংলা বাস্তব আজ, বিশ্বের বিস্ময়!
তোমারই যোগ্য সাহসী কন্যা ফিরালেন ফের
জয় বাংলার জয়।

ডিএফপি নং. ১০/১৬-০৩-২০২৪